আমাদের বুকশেলফ

মুহম্মদ জাফর ইকবাল | *তারিখ: ২৫-১০-২০১২*

স্মৃতির অ্যালবামে গুলতেকিন ও হুমায়ূন আহমেদ

মুহম্মদ জাফর ইকবাল, আহসান হাবীব ও হুমায়ূন আহমেদ

ছবি: নাসির আলী মামুন

আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় কেটেছে অনেকটা পিকনিকের মতো করে। মানুষ যখন বাসায় থাকে, তখন সত্যিকারের বিছানায় ঘুমায়, সত্যিকারের কাপড় পরে, সত্যিকার থালা-বাসন, কাপ-পিরিচে খায়। যখন হঠাৎ করে কেউ এক-দুই দিনের জন্য পিকনিকে যায়, তখন কোনো কিছুই সত্যিকারের হয় না—জোড়াতালি দিয়ে কাটিয়ে দেয়। যুদ্ধের পর যখন দেশ স্বাধীন হলো, তখন আমাদের সবকিছুই ছিল জোড়াতালি দেওয়া। বিছানা নেই, তাই মেঝেতে শুয়ে ঘুমিয়েছি। কাপড় নেই, তাই একে অন্যের কাপড় পরেছি। আইসক্রিমের কাপে চা খেয়েছি—সেসব নিয়ে আমাদের সে রকম মাথাব্যথাও ছিল না। পুরো জীবনটাই একটা বড় পিকনিক, ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগত না।

এ রকম সময় হুমায়ূন আহমেদ ঠিক করল, বিয়ে করবে। যাকে বিয়ে করবে, সে বাচ্চা একটি মেয়ে, হুমায়ূন আহমেদের বই

পড়ে মুগ্ধ হয়ে পরিচয়, পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা আর সেখান থেকে বিয়ের পরিকল্পনা। মেয়েটির পরিবার খুব অবস্থাপন্ন, দেশের সবাই চেনে সেই প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ সাহেবের নাতনি। হুমায়ূন আহমেদ তখনো হুমায়ূন আহমেদ হয়নি। তাই এ রকম পরিবারের চালচুলোহীন একটা ছেলের সঙ্গে এত কমবয়সী একটা মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কথা নয়—কিন্তু তারা বিয়ে দিতে আপত্তি করলেন না।

হুমায়ূন আহমেদ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার। বিয়ের আগে আগে আমাদের বাসাটা দেখে তার মনে হলো, এত বড় সচ্ছল পরিবারের একটা মেয়েকে আমাদের বাসায় আনা হচ্ছে—বাসায় আরও কিছু ফার্নিচার থাকা দরকার। সে কীভাবে কীভাবে কিছু টাকা জোগাড় করে একদিন আমাকে নিয়ে বের হলো ফার্নিচার কিনতে।

রিকশা করে নিউমার্কেট এলাকায় গিয়ে একটা ফার্নিচারের দোকানে এর দাম দেখে আমাদের প্রায় হার্ট অ্যাটাক হওয়ার মতো অবস্থা। কেনা দূরে থাকুক, ফার্নিচারের গায়ে হাত বোলানোর মতো অবস্থাই আমাদের নেই। আমরা দুই ভাই মনমরা হয়ে এক ফার্নিচারের দোকান থেকে অন্য ফার্নিচারের দোকানে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে শেষে বের হয়ে এলাম।

হুমায়ূন আহমেদ একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ‘এক কাজ করলে কী হয়?’

আমি বললাম, ‘কী কাজ?’

‘কিছু ফার্নিচার বানিয়ে ফেললে কেমন হয়?’

আমি হাতে কিল দিয়ে বললাম, ‘ফার্স্ট ক্লাস আইডিয়া।’

(এখানে বলে রাখা ভালো, কেউ যদি আমাকে বলে, খামোখা বাইপাস সার্জারির জন্য হাসপাতালে না গিয়ে ইন্টারনেটে দেখে বাথরুমে বাইপাস সার্জারি করলে কেমন হয়? আমি সম্ভবত হাতে কিল দিয়ে বলব, ফার্স্ট ক্লাস আইডিয়া।)

আমি জানি, বিষয়টা বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু আমরা দুই ভাই সত্যি সত্যি ফার্নিচার না কিনে কিছু কাঠ, একটা করাত, হাতুড়ি-বাটালি, রেদা ও কিছু পেরেক কিনে বাসায় হাজির হলাম। আমি জানি, অন্য যেকোনো পরিবারের লোকজন এ রকম কাণ্ড ঘটতে দেখলে মাথায় থাবা দিয়ে হায় হায় করতেন, কিন্তু আমাদের অন্য ভাইবোন এবং মা ব্যাপারটাকে খুবই স্বাভাবিকভাবে নিলেন। (বাবা বেঁচে নেই, বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই আরও বেশি উৎসাহী হতেন।) বসার ঘরে বসে কী ফার্নিচার তৈরি করা যায়, সেটা নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। সোফা সেট থেকে শুরু করে হারমোনিয়াম রাখার বাক্স পর্যন্ত একটা বিশাল তালিকা তৈরি হলো। শেষ পর্যন্ত একটা বুকশেলফ দিয়ে এই প্রজেক্ট শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

বাসার ছাদে বাতি জ্বালিয়ে কাজ শুরু হলো। করাত দিয়ে কাঠ কাটা দেখে কখনোই মনে হয়নি কাজটা কঠিন। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই আবিষ্কার করলাম, আসলে সেটা অনেক কঠিন একটা কাজ। শেষ পর্যন্ত কোনোভাবে কাঠের তক্তাগুলো মাপমতো কাটা হলো। এখন রেদা দিয়ে সেগুলো পলিশ করা। যেটুকু উৎসাহ তখনো বাকি আছে, সেটুকু দিয়ে কাঠ পলিশ করা শুরু হলো এবং এই পর্যায়ের মাঝামাঝি হুমায়ূন আহমেদ প্রজেক্ট থেকে খসে পড়ল। (এটি অবশ্য নতুন কিছু নয়, বড় ভাই হিসেবে যেকোনো ঝামেলা থেকে সে খসে পড়ে এবং সবকিছু ধীরে ধীরে কীভাবে কীভাবে জানি ছোট ভাই আহসান হাবীবের ঘাড়ে এসে পড়ে।) আমি অবশ্য হাল ছেড়ে দিলাম না। আমার সমবয়সী এক মামাকে নিয়ে কাঠের মাঝে রেদা চালিয়ে যেতে লাগলাম। কাঠগুলো কেনার সময় টের পাইনি। এখন আবিষ্কার করছি, কাঠগুলো বাঁকা এবং সেই বাঁকা কাঠ রেদা চালিয়ে সোজা করতে আমাদের জান বের হয়ে যাওয়ার অবস্থা।

যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত কাঠের তক্তাগুলো মাপমতো কেটে, সোজা ও পলিশ করে রেডি করা হলো। এখন পেরেক ঠুকে সেগুলো লাগিয়ে নিলেই বুকশেলফ হয়ে যাবে। আমরা শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে ঘুমাতে গেলাম। সারা শরীরে ব্যথা—তবে ঘুমটা হলো খুব গভীর।

সকালে তক্তাগুলো দেখে আমাদের আক্কেলগুড়ুম। রেদা দিয়ে ঘষে যে তক্তাগুলো সোজা করা হয়েছে, সারা রাতে সেগুলো আবার বাঁকা হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞ মতামত নিয়ে জানা গেল, ভেজা কাঠের তা-ই নিয়ম—আমাদের বোকা পেয়ে কাঠের দোকানদার ভেজা তক্তা গছিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রজেক্ট তো আর ফেলে রাখা যায় না। তাই আবার নব উদ্যমে কাঠ পলিশ করা শুরু হলো। সবকিছু শেষ করে ঘুমাতে গিয়েছি—সকালে উঠে দেখি আবার বাঁকা হয়ে গেছে। হুবহু গ্রিক পুরানের সেই সিসিফাসের অবস্থা। যে সারা রাত একটা পাথর ঠেলে পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি নিয়ে পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখে, সেটা পাহাড়ের নিচে আগের জায়গাতেই আছে। আমাদের যেহেতু সিসিফাসের ধৈর্য নেই, তাই ঠিক করা হলো, কাঠগুলোকে বাঁকা হওয়ার সুযোগ দেওয়া যাবে না, তার আগেই পেরেক ঠুকে শেলফ বানিয়ে ফেলতে হবে। কাজেই পরের বার আমরা আর দেরি করলাম না। পলিশ করে সোজা হওয়ার পর দ্রুত পেরেক ঠুকে শেলফ তৈরি করে ফেললাম। সেটার ওপর কালো রং দেওয়ার পর শেলফের সৌন্দর্য দেখে আমরা নিজেরাই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ড্রয়িংরুমে এনে তার মাঝে যখন বই রাখা হলো, তখন তার সৌন্দর্য আরও শতগুণে বিকশিত হলো। কাঠমিস্ত্রি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার গৌরবে অহংকারে আমাদের মাটিতে পা পড়ে না।

যথাসময়ে হুমায়ূন আহমেদের বিয়ে হলো, কমবয়সী বাচ্চা একটি মেয়ে আমাদের ভাবি হয়ে বাসায় উঠে এল। অত্যন্ত সচ্ছল একটা পরিবার থেকে চালচুলোহীন একটা পিকনিক মার্কা পরিবারে এসে আমাদের এই বাচ্চা ভাবি খুব সুন্দরভাবে মানিয়ে নিয়েছিল—সেখানে আমাদের ঐতিহাসিক বুকশেলফের কোনো ভূমিকা ছিল কি না, কখনো তাকে সেটা জিজ্ঞেস করা হয়নি।

ধীরে ধীরে বড় ভাই আজকের 'হুমায়ূন আহমেদ' হয়ে উঠল। একসময় দেখা গেল, তার টাকাপয়সার সমস্যা নেই, ফার্নিচার কিনতে গিয়ে তার ভেজা কাঠের তক্তা আর হাতুড়ি-বাটালি কিনে ফিরে আসতে হয় না। যেভাবে টাকা আসত, সেভাবে খরচ করতে শিখে গেল। যেমন, একবার ঠিক করল, পরিবারের সবাইকে নিয়ে নেপাল থেকে ঘুরে আসবে। ভাইবোন, তাদের স্বামী-স্ত্রী, বাচ্চাকাচ্চা, বন্ধুবান্ধব সব মিলিয়ে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজনের দল! তাদের সবার জন্য প্লেনের টিকিট কেটে নেপালে নিয়ে হোটেলে রেখে সব জায়গায় ঘুরে বেড়ানো বিশাল খরচের ব্যাপার। কিন্তু সেটি নিয়ে সে কখনো দুর্ভাবনা করেছে বলে মনে হয়নি।

নেপাল ভ্রমণ নিয়ে ছোট্ট একটা ঘটনার কথা বলে শেষ করি। আয়োজন করার সময় হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম, আমার মা যেতে চাইছেন না। তাঁকে রাজি করানো যাচ্ছে না, তাই আমাকে রাজি করানোর দায়িত্ব দেওয়া হলো।

আমি একদিন মাকে বললাম, 'আপনি কি জানেন, নেপালের কাঠমান্ডু এয়ারপোর্ট হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক এয়ারপোর্ট। পাহাড়ের মাঝখানে হঠাৎ করে নেমে প্লেন ল্যান্ড করতে হয়। অনেকবার প্লেন ক্র্যাশ করে সব প্যাসেঞ্জার মারা গেছে।'

আমার মা আতঙ্কিতভাবে আমার দিকে তাকালেন, 'তাই নাকি!'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। তার মানে বুঝতে পারছেন তো? আপনার সব ছেলেমেয়ে, তাদের বউ, জামাই, আপনার সব নাতি-নাতনি একটা প্লেনে করে যাচ্ছে। কোনোভাবে যদি সেই প্লেন ক্র্যাশ করে, তা হলে আপনার ছেলেমেয়ে, বউ-জামাই, নাতি-নাতনি সবাই শেষ। আপনি শুধু একা বেঁচে থাকবেন। সারা পৃথিবীতে আপনার কেউ নেই—আপনি থাকবেন একা। এ-কা!'

আমার মা কাঁপা গলায় বললেন, 'আমার জন্যও প্লেনের একটা টিকিট কাট!'

বলা বাহুল্য, আমার মা এবং তাঁর সব ছেলেমেয়ে, বউ-জামাই, নাতি-নাতনি নিয়ে সেই প্লেন ক্র্যাশ করেনি। সবাই মিলে যা

আনন্দ করেছি, সেটা লিখতে হলে আরেকটা বই হয়ে যাবে। আমাদের পুরো পরিবারের জীবনটা এভাবে হুমায়ূন আহমেদ বর্ণাঢ্য আর আনন্দময় করে রেখেছিল।

শুধু কি আমাদের পরিবারের? তার পাঠক, তার নাটক ও চলচ্চিত্রের দর্শকদের জীবনও কি সে সমানভাবে আনন্দময় করে রাখেনি?